পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

কবিতা ও কম্যুনিকেশন

অমুকের কবিতা বোঝা যায় না, কম্যুনিকেট করে না, ইলিয়ট বলেছিলেন পোয়েট্রি মাস্ট...ইত্যাদি ইত্যাদি গোটা কবিতাজীবন ধরেই শুনছি। কিন্তু কবিতা কী এক যোগাযোগ ব্যবস্থা? অন্তত পাশ্চাত্য কাব্যশিল্পে বিগত ৫০ বছর ধরেই কিন্তু সেটা আর মানা হয় না। কবিতাকে যোগাযোগব্যবস্থা বললে, সেটা এই বিভ্রমের অধীনে কাজ করে যে যোগাযোগ মানেই একজন অন্যজনকে বুঝবেন। এমনকি ধরে নেওয়া হয় যে যোগাযোগের পূর্বেই একে অপরকে বুঝেছেন, তাই যোগাযোগ গড়ে উঠছে।

কবিতা আসলে যোগাযোগব্যবস্থা নয়। নানা কারণে। বার্তা প্রেরণ- গ্রহণ একটা খেলাএকটা প্রথা। আর , কবিতা মূলত খেলার নিয়মের বাইরের এক খেলা, প্রথাকে চিনিয়ে পরমুহূর্তেই তাকে কাঁচকলা দেখিয়ে অন্যত্র চলে যাবার প্রথা। কোনো habituation –এর ভিত্তিতে কবিতা কাজ করে না। Habituation কি করে, সব আত্মসাৎ করে – বস্তু, বাস্তবতা, মূর্ত ও বিমূর্তকে গ্রাস করে। জীবন বলে যে কিছু আছে এই উন্মত্ত, গোগ্রাসী খিদে সেই বোধটাকে মেরে ফেলে। একমাত্র শিল্পই জীবনের চেতনাকে পুনরুদ্ধার করতে। আকাশটা যে আকাশী আর পাথরটা পাথুরে, সেটা শিল্পই বোঝাতে পারে। এবং আরো বড়ো কথা হলো সে সেটা এক ত্রিঘাত উপায়ে বোঝাতে পারে।

আবার যদি কেউ বলেন কবিতা যোগাযোগব্যবস্থা নয় একেবারেই। তারই বা কী অর্থ? কবিতা এ জগত সম্বন্ধে ইনফর্ম করে না যেমন, তেমনি কিন্তু মনের, বোধের বুদ্ধির ভেতরে একরকমভাবে ইনফর্ম করে। অর্থাৎ যোগাযোগ করে। এ বাড়ির গানের সুর যেভাবে বাতাসের সাহায্যে পাশের বাড়ি গেলো অনেকটা সেভাবেই কবিতার যোগাযোগ। সুতরাং বাতাসের মতোই কবিতারও একটা বায়বীয় মাধ্যম নিশ্চয় আছে কোথাও। হয়তো, বলা যায়না, ভবিষ্যের মনোবিজ্ঞান এইসমস্ত সম্পর্ককে আরো স্বচ্ছে করে তুলবে। যেকোনো সংঘটিত যোগাযোগব্যবস্থার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে। কবিতা এই সমস্ত শৃঙ্খলা মেনে চলে না, গ্রাহকের কাছে বিশ্বস্ত পোস্টম্যানের মতো পৌঁছে দেয় না এক স্বচ্ছ, সহজ বার্তা। অবশ্য তেমন কবিতাও আছে। তেমন কবিতাই বেশি, আর তাদেরই এ লেখায় ‘কবিতা’ বলতে চাইছি না।

কবিতা তো জীবনবিচ্ছিন্ন নয়, প্রকৃতির নয়ানজুলি নয়। কবিতা অমৃত। গাছ একভাবে। সমর সেন লিখেছিলেন - ‘গাছের যৌবন তবু প্রতি বছরে ফেরে / আমরা মরি স্বখাত সলিলে।’ ফিরে আসতে হয় কবিতাকেও, কাদামাটি জলের জোরে ধুয়ে আয়নায় আবার নিজেকে দেখতে হয়। মায়ের কায়ামৃত্তিকা গঙ্গার গর্ভেই ডুবুরী নামিয়ে তুলে আনতে হয়। তারপর আবার কবিতার কাজ তার ওপর। আকার, ইঙ্গিত, ভঙ্গি , অঙ্কন, বর্ণ কত কি। পূর্ণাঙ্গ কবিতার সেই মুখটি, সেই সজল বা তেজী চোখদুটিকে আবার বিসর্জন দেওয়া। আবার অপেক্ষা করা কবিতার নবজন্মের। ছেলেকে নিয়ে আমরা সার্কাসে গেলাম সেদিন বহুবছর পর। লক্ষ্য করি সার্কাসে কি বৃত্তের ভীড়। সঙ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে গোলাকার রিং। তার নাক গোল, তার চোখ গোল। রঙিন বেলুনের ছড়াছড়ি। খেলা দেখানোর চত্বরটাও গোলাকৃতি। সার্কাসের মধ্যে একটা চক্র আছে। সার্কাসের কোথাও একটি ঋতু। বছরের একটা বিশেষ সময়ে তাদের তাঁবু পড়ে শহরে। কোথাও শীত তখন। কোথাও বসন্ত।

তাহলে কবিতা কী এক ফিরে আসা? কিন্তু কি ফিরে এলো ? কে ফিরে এলো ? ফিরে এলো কথকতা। বেশ, কথা নিয়েই কথা হোক প্রথমে। কবিতা এক লোকের অন্য লোকের সাথে কথা কওয়া। ওয়ার্ডস্বার্থ বলেছিলেন কবে। রবি তার প্রতিধ্বনি করলেন। যুদ্ধে যুদ্ধে ছিঁড়ে গেল বিশ শতকের প্রথমাধ। আউশভিচ-এ নাৎসী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত কবিতাচেতনাতে ধাক্কা লাগছে তখন। অডেন বললেন - 'আউশভিচের পর আর কবিতা লেখা যায় না।' কিন্তু কবিতা লেখা যায় না মানে কি ! অবশ্যই লেখা যায়। কিন্তু এই কবিতা নয়। ধ্রুপদী, শিল্পিত কবিতার বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন ইউরোপের অ্যান্টি-কবিরা পঞ্চাশ ষাট দশকে এসে। অথচ তাঁরাও বললেন যোগাযোগের কথা। বরং যোগাযোগের তাগিদ তাঁদের আরো বেশী। নিকানোর পারা তাঁর কবিতার সারাংশের খোঁজে বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ। 'শ্লেষ' যেন কথোপকথনের সেরা যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিকানোর পার্‌রা বললেন -

' আমার মনে হয় কবিকে এক দারুণ মুখপত্র হয়ে উঠতে হবে। এবং শ্লেষ ও মেধাবী সরসতা এখানে অত্যন্ত আবশ্যক। সরসতা পাঠককে ছুঁতে পারার শক্তি বাড়ায়। মনে রেখো সরসতা যখন কবির শেষ হয়ে গেছে, তখনি তাকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে হয়।'

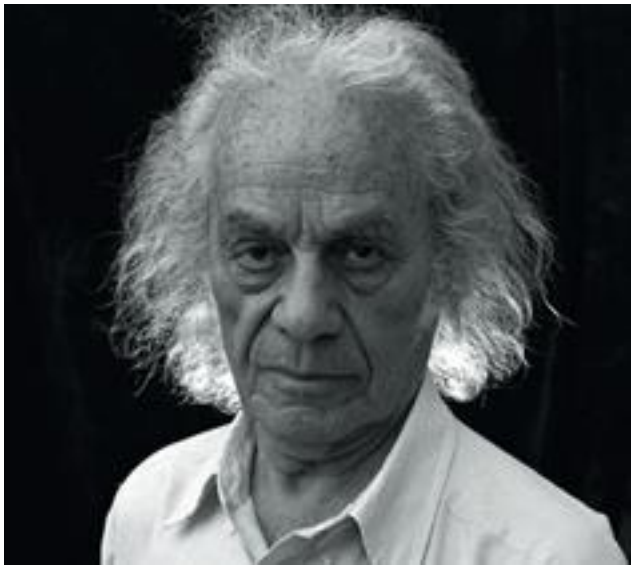

নিকানর পার্‌রা

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়, কম্যুনিজম ইউরোপের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ার বরফে জমাট বাঁধে। আধুনিক যুগ ক্রমে পেরিয়ে যায়। অথচ উত্তরাধুনিকতা পেরিয়ে এসেও গত শতকের অন্যতম আলোচ্য, জীবিত কবি, জন অ্যাশবেরী বলছেন তাঁকে অনেকেই ভুল বুঝেছেন। গোটা পৃথিবী তাঁকে দুর্বোধ্য বললেও তিনি সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করে গেছেন যোগাযোগ রাখতে। ৬০- এর দশকে বলেছিলেন – 'আমার কবিতার সমালোচনায় বহুবার এমন বলা হয়েছে যে আমি পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এখানে আমার একটা বক্তব্য রয়েছে। আমি কিন্তু সবসময় কম্যুনিকেট করতে চেয়েছি এবং আমার মনে হয় যে কবিতা যদি পাঠককে এমন কিছু জানায় যা পাঠক ইতিমধ্যেই জানে, সেই কবিতা আসলে একেবারেই কম্যুনিকেট করছে না। বরং সেই কবিতা পাঠককে অশ্রদ্ধা করে।'

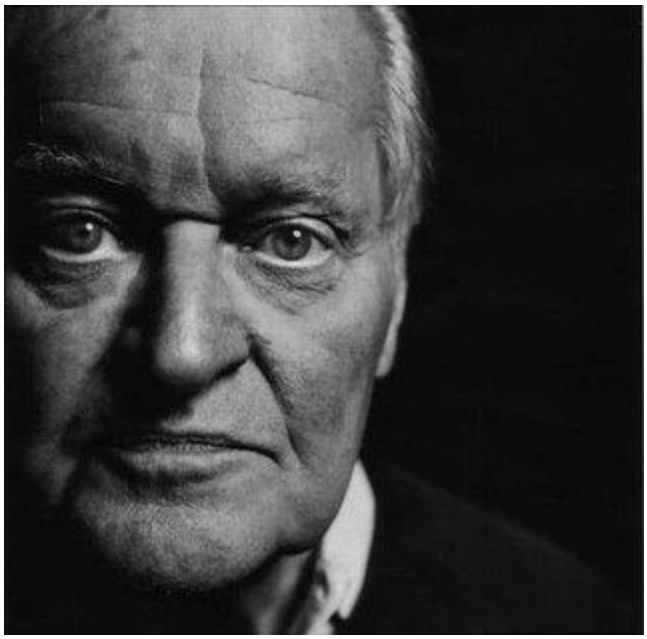
জন অ্যাশবেরি

এককালে রাজকবিরা ছিলেন। তাঁরা মূলত ঘোষণা করতেন রাজসভায়। রাজার দরবার থেকে একদিন এঁরা রাজপথে এলেন। দেখলেন পথিমধ্যের জীবন। সমাজ সচেতন একটি জীবের জন্ম হলো তাঁর মধ্যে। এলো তথ্যায়ন । ঈশ্বর গুপ্ত সেকালের বাঙালী সমাজের পালা-পার্বন, রীতিপ্রথার রটনা করেছেন। রূপচাঁদ পক্ষী খাঁচায় করে গিমিকবন্দী হয়ে আদি কলকাতার রাস্তায় নেমে গেয়েছেন সামাজিক খেউর। নগরবর্ণনা। তারো পূর্বে কবির লড়াই নিয়ে এসেছে সংলাপের কাঠামো। নিয়ে এসেছে মন্তব্য। কবিতা আবার কথোপকথনের। নাট্যের। কবি সাধারণ্যে নেমে যেমন নিজের ঢাক পেটান, তার প্রতিদ্বন্দীকে নস্যাৎ করেন, তেমনি ব্যক্তিগত মন্তব্য করেন সমাজজীবনের নানা বিষয় নিয়ে। মতামত দেন। কিন্তু রাজগরিমা ছেড়ে এসেছিলেন কবিয়াল। নিজের যাবতীয় দেবদ্যুতি ঘুচিয়ে বলেছেন -

‘ ওরে, আমি সে ভোলানাথ নই
আমি ময়রা ভোলা
হরুর চেলা
বাগবাজারে রই ’

– ভোলা ময়রা

এক অর্থে বুর্জোয়া সংস্কৃতি থেকে সরে আসা কবি এই কবিয়াল। জনতার খোলা তরবারির সামনেই তাদের ঠুকোঠুকি, মুর্গি-লড়াই। আবার অন্যভাবে দেখলে তিনিও বুর্জোয়া। কবিয়ালি তাঁর পেশা। তাঁর পেটের দায়। তিনি যাঁদের সভাঘরে ভাড়া খাটেন তাঁরা জমিদার। বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কবিতার কাজ কিন্তু শেষ হয়নি। প্রতিরোধ ফিরে ফিরে এসেছে। ১৯৮০-র গোড়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাকবিতার স্বপক্ষে চার্লস বার্নস্টাইনরা একই কথা বললেন। সম্প্রতি অধ্যাপক বার্নস্টাইনের সঙ্গে ল্যাঙ্গেয়েজ পোয়েট্রি নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছিল। বার্নস্টাইন বলছিলেন, ‘মরা ভাষা যোগাযোগকেও মেরে ফেলে। তাকে বুর্জোয়াদের সুখযন্ত্র করে তোলে। আমরা তার বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছি।’

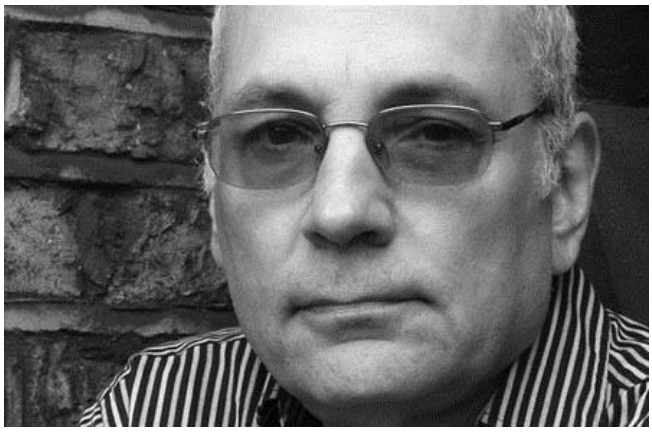

চার্লস বার্ন্সটাইন

কবি শ্রোতার থেকে দূরে সরে যান। তাঁকে এখন পাঠ করতে হয়। ফলে শ্রোতার বদলে পাঠক আসে। যেমন পাঠ নিভৃত, ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে, তেমনি কবিও হয়ে ওঠেন তাঁর নিজের পোষা জীব। কবিদের মধ্যে অনেকেই পাঠকের কথা ভাবতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। কারণ কবি এখন আর পাঠককে দেখতে পান না। ব্যক্তিগত আবেগ আসে। প্রতিবাদ বা দুঃখে বিলাপ আসে। আসে বিড়েবিড়ে স্বগতোক্তি। তবু কবি অনর্গল বেরিয়ে আসতে চান তাঁর পাঠকের কাছে। তাঁর উপাসক ও উপাসনা এখন এক হয়ে যাবার উচ্চাকাঙ্খায়। কবিতা গড়ে ওঠে উদ্দিষ্টের জন্য। চিরকালই তো তাই। রবিকে মনে না করে উপায় নেই এখন। ' কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে / সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।'

কিন্তু ক্রমশ কবির ভাবনা আর পাঠকের ভাবনার জায়গাটা আলাদা হয়ে গেল। সমাজ আমি-প্রধান হয়ে উঠেছে। বড় গোত্র, বড় পরিবার বড় বাড়ী ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট নগরকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। রবি যে বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন এই পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২০০ কোটির কম। অর্থাৎ একশো বছরেরও কম সময়ে মানুষ তিনগুনের চেয়েও বেশী হয়েছে। কমে আসছে বাগান, বেড়ে যাচ্ছে পার্ক। তবু পাঠক এখন আর সদলবলের লোক নয়। সে একক। যেমন একেক কবি। কবি কি বলতে চেয়েছেন সেসব নিয়ে যেমন পাঠকের কিছু যায় আসে না । পাঠক নিয়ে কবিও ভাবেন না। স্বগতোক্তি থেকে যায়। আরো আসে ধারাভাষ্য। এক একটা আচমকা মুহূর্তের, ভাবনার। মনের মধ্যে যে শব্দ ও যুক্তি ক্রীড়া চলে তারই ধারাবিবরণীর দিকে কবি ঝোঁকেন।

কবিতা কথা বলে। কথা দিয়ে, ধ্বনি, শব্দ দিয়েই কবিতা নির্মিত। কথা কী দিয়ে, কীভাবে তৈরি হয়? কথার নির্মানপ্রক্রিয়ায় রয়েছে এই সমস্ত উপাদান - আলাপ,সংলাপ, বিলাপ, ধারাভাষ্য, মন্তব্য ও উক্তি, স্বগতোক্তি, তথ্যায়ন ও ঘোষনা।এরা সকলেই ফিরে ফিরে এসেছেন। যুগোত্তীর্ণ অবতারের মত।

তবে কি কবিতা নিজেই একটি যোগাযোগ? নিজের প্রশ্নের কাছে নিজের বিন্যাস নষ্ট হচ্ছে। নিজের কথা বলার সময় এসেছে এবার। আমার মনে হয়েছে - না, কবিতা কখনোই একটি যোগাযোগ নয়। বরং তার একটা নিজস্ব সত্ত্বা আছে যে যোগাযোগ করতে চায়। কবি চাইলেও চায়, না চাইলেও চায়। কিন্তু, কবিতাকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে, একইসঙ্গে 'যোগাযোগ' কে নিয়েও সেই দ্বন্দ্ব। যিনি বললেন কবিতাকে কম্যুনিকেট করতে হবে, তিনি 'কম্যুনিকেশন' সম্বন্ধে অনেক কিছুই অনুমান করে নিলেন। যিনি বললেন - কবিতা আর কম্যুনিকেট করছে না, তাঁর যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়তো বিছিন্ন হয়ে গেছে। কবিতা কয়েকটি বার্তা দেওয়া নেওয়া করার বৈদ্যুতিন যন্ত্র নয়। কারণ যোগাযোগ ধরে নেয় আমরা নিজেদের বুঝবো, এবং এটা যোগাযোগ ঘটার পূর্বেই ধরে নেয়। এবং বোধের সর্বাংশ তৈরি করে দেয় আমাদের অভ্যাস, অভিজ্ঞতা। তার দ্বারা বোধ

সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। যতক্ষণ না গ্যালিভারের ঘুম ভাঙলো সে ঐ লিলিপুটদেরই শিকার। অবাস্তব শিকার হলেও, সত্য শিকার। কবিতাই গ্যালিভারের ঘুম ভাঙায়।

শাসক, সমাজ, রাজা, সরকার, ধর্ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যায়। অস্বাভাবিককে জোর করে চাপিয়ে দেয় মনের ওপর। বস্তুর ওপর পর্দা পড়ে যেতে থাকে। আমরা তার সরল গুণটিকে ভুলে যাচ্ছি। স্রেফ অভ্যাস দোষে। ' নিজেরই মুদ্রাদোষে নিজের চেয়ে হতেছি আলাদা' (জীবনানন্দ)। কিন্তু এই আলাদার একাকীত্ব কি ঠুলিটা সরিয়ে দিতে পারছে ? এর উত্তর জীবনানন্দে খুব স্পষ্টত পাইনি। এখানে বনফোয়ার কথা মনের মধ্যে পাক দিয়ে ফিরে আসে। ফরাসী ভাষার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবীণ কবি ইভ বনফোয়া। বনফোয়া মৃত্যুকে জীবনের একটি পূর্বস্তর হিসেবে দেখতে চান। মরে যাওয়ার পরেও তাঁর কবিতায় মানুষ অনুভব করে। মৃত্যু ফিকে হয়ে একটা আবছা, সাময়িক অনস্তিত্ব হয়ে রয়ে যায় কেবল। বনফোয়া আজীবন বাস্তব ও কবিতার আত্মার সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছেন। অস্তিত্বকে মেনে নিলে তার শুরু ও শেষকে মেনে নিতে হয়। মৃত্যুকে এক শেষ যতি হিসেবে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকেনা। ফলে অস্তিত্বের প্রশ্নটি বনফোয়ার কবিতায় বরাবরই তর্কময়, নিরবচ্ছিন্ন। 'কবিতার কাজ বস্তুকে তার সঠিক পরিচয় ফিরিয়ে দেওয়া।'

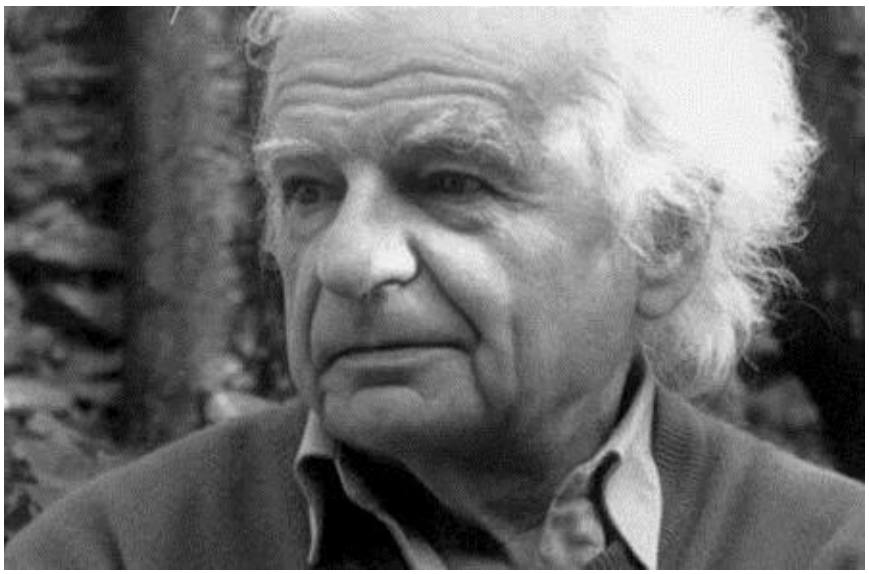

ইভ বনফোয়া

সেই কবে স্বদেশ সেনের কবিতায় আমরা বনফোয়ারই সমভাবনা দেখেছিলাম। 'আপেল ঘুমিয়ে আছে ওকে তুমি দাঁত দিয়ে জাগাও/ নতুন ছালের নীচে রক্ত চেপে খেলা করে দাঁত/ সহজে, আপন মনে চরাচর শান্ত দেখে খুন হয়ে যায়/ আপেলফুলের দিন শেষ হয়, বেড়ে ওঠে নির্বিকার দাঁত'। এক সমালোচক বলেছিলেন এই কবিতাটি আত্মপ্রতিকৃতি ভাঙার কবিতা। আজ পড়তে গিয়ে আমার কিন্তু মনে হল যে আপেল ঘুমিয়ে ছিল তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ব্যবহারিক মূল্যবোধে। দাঁত দিয়ে আপেলের পূর্ণ অনুভবকে ফিরিয়ে আনা হল। আপেলকে মানুষের চোখে 'আপেল' এর মত দেখা হল। টের পওয়া গেল তার জীবন, 'নতুন ছালের নীচে' তার 'রক্ত'। এবং টের পাওয়া গেল কিভাবে মানুষের অনুভবের সম্পূর্ণতায় এক একটা প্রাকৃতিক খুন ঘটে যায়। আপেলফুলে লেগে থাকা রোমান্টিকের দিন শেষ। আমাদের অনুভবের নৈব্যক্তিকতাই যেন আপেলের সত্যিকারের সত্ত্বাকে পুনরাবিস্কার করে।

এমন ভাবা যায়, কবিতা ঘটনার স্বরলিপি। একটি মৌখিক ঘটনা - যার নিজস্ব ধারাভাষ্যের মধ্যে কবির অভিজ্ঞতার চাদর বিছানো। কবি যেখানে ক্রমাগত নোট করে নিচ্ছেন সেই আশ্চর্য অনুভবের অনুরণন, তাদের যাবতীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য-এর তারতম্য। স্বরের, শব্দের নিজস্ব নকশা তৈরি করে নিচ্ছেন। যতির নিজস্ব

ব্যবহার। তার বহুবচন থাকছে কিন্তু কোন বক্তব্য থাকছে না। এক তরুণ একবার আমায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে কবিদের কোন কথা জিজ্ঞেস করলে কোন স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। 'হ্যাঁ' বা 'না' তাঁরা বলতে পারেন না। কথাটা সত্যি। খুব ঠাট্টার নয়। সাদা-কালোর মাঝখানের রামধনুটাকে খুঁজে বের করার কাজ তাঁর। ফলে তাঁর সাদা নেই, কালো নেই।

যোগাযোগের বিভিন্নতা বা আপেক্ষিকতার সঙ্গে সঙ্গে 'অর্থ' এর প্রশ্নটিও এসে হাজির। একই কবিতা যদি একেকজন পাঠকের সঙ্গে একেকভাবে যোগাযোগ ঘটাতে সম্ভব হয়, তবে কবিতার পংক্তি বা শব্দের কোন একটি বিশেষ অর্থ থাকার তত্ত্বটিকে নিহত হতে হয়। আজকের মার্কিণ ভাষাকবিতার জনক চার্লস বার্নস্টাইন বা একদা 'বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ' এর সমর্থক জন অ্যাশবেরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, সেই সুর আমাদের কাছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র শব্দে পৌঁছেছে গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সুধীন্দ্রনাথ বলতেন - 'কাব্য সৃষ্টি হয় ভাব দিয়ে নয় কথা দিয়ে'। তাঁর অনেক গবেষক (যেমন অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী) এটা মনেপ্রাণে মানতে পারেননি। অথচ সুধীন্দ্রনাথ যখন লেখেন - 'একটি কথার দ্বিধাথরোথরো চূড়ে / ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী, তাঁর গবেষকরা খুঁজেছেন তাঁর সেই তাড়িয়ে দেওয়া ভাবকে। আমার কিন্তু আজ কোন ভাবের কথা ভাবতে ইচ্ছে করলো না। মনে হল, ঐ 'সাতটি অমরাবতী' আসলে সাতটি অর্থের অভিভাব। একটি কথার যে সাতরকমের মানে হতে পারে সেই সংকেত। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় একই সুরে লেখেন - 'আর আমরা যখন বুঝতে পারি যে এই কৃষক হলেন কবি নিজে, আর 'রাশি রাশি ধান' তাঁর কাব্যসমূহ, আর নাবিকটি মহাকালের দূত, তখনই কবিতাটিকে আমরা প্রায় ফুরিয়ে ফেলি, আমাদের আর কিছু পাবার থাকেনা তার কাছে।'

ক্রমশ লক্ষ্য করা যায়, যে শিল্প যত বিমিশ্র, যৌগিক তার যোগাযোগের ক্ষমতা তত সম্পন্ন। কবিতা শব্দশিল্প। কিন্তু কবিতা শুদ্ধশিল্প নয়। যেমন ভারতীয় রাগ সঙ্গীত, যা শব্দভাষাকে ঘৃণা করে, মনে করে সুরমূর্ছনাই সঙ্গীতের নিজস্বভাষা। চিত্রকলাও শুদ্ধশিল্প। আদিগন্তকালের ইউরোপীয় শিল্প তো, বটেই উনিশ শতকের (ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের) চীনা, কোরীয় প্যানেল চিত্রশিল্প শব্দকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে বরাবর। তাঁদের প্রতিভাবান শিল্পীরা পোস্টারজাতীয় চিত্রশিল্পের বিরোধিতা করেছেন। পোস্টার চিত্রকলা কে ইউরোপে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হত না। প্যারীর ফরাসী ছায়াবাদী শিল্পীদের সঙ্গে প্রথম প্রথম তুলো লত্রেকে একগোত্রভুক্ত করা হত না। পোস্টারশিল্পী হিসেবে ছোট করে দেখ হত। মিকেল্যাঞ্জেলো কবিতা লিখলেও কদাপি শব্দকে চিত্রের সঙ্গে মেশাননি। রবি তবু কিছুটা। আমেরিকায় লরেন্স ফের্লিংগেটি।

বিশ শতকের মাঝামাঝি বিভিন্ন শুদ্ধ শিল্পের এই অস্পৃশ্যতা কেটে যেতে থাকে। কিন্তু কবিতা বরাবরই ছিল বিমিশ্র এক শিল্প, যা গানের ভাবনা থেকে নিয়েছে, স্বর ও ধ্বনিকে কুর্নিশ করেছে, চিত্রভাবনার রশদে ভরে উঠেছে, ভাস্কর্যের কলা ব্যবহার করেছে তার বাক্যে, ছত্রে মায় আকৃতিতে। তবু কেন কবিতার বিরুদ্ধে এই কম্যুনিকেশনের অভিযোগ ? আসুন, বর্জন মনোভাবকে সরিয়ে রেখে একটু ভাবি।

= = =